عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ
تُنْسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧﴾

(১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ তোমার আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয়। তোমাদেরকে জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৮) তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে একসঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (১২৪১) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (১২৫) সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। (১২৭) এমনিভাবে আমি

**তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

এবং আমি ইতিপূর্বে (অর্থাৎ অনেকদিন আগে) আদম (আ)-কে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম (একটু পরেই তা বর্ণিত হবে)। অতঃপর তার পক্ষ থেকে গাফিলতি (ও অসাবধানতা) হয়ে গিয়েছিল এবং আমি (এই নির্দেশ পালনে) তার মধ্যে দৃঢ়তা (ও অবিচলতা) পাইনি। (এর বিবরণ জানতে হলে) স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাগণকে বললাম ঃ তোমরা আদমের সামনে (অভিবাদনের) সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল। অতঃপর আমি (আদমকে) বললাম ঃ হে আদম, (স্মরণ রাখ,) এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর (একারণে) শত্রু (যে, তোমাদের ব্যাপারে বিতাড়িত হয়েছে)। সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয় (অর্থাৎ তার কথায় এমন কোন কাজ করো না, যার কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হও)। তাহলে তোমরা (জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে) কষ্টে পতিত হবে। (তোমার স্ত্রীও কষ্টে পড়বে; কিন্তু বেশীর ভাগ কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হবে আর) এখানে জান্নাতে তো তোমাদেরকে এই (আরাম) দেওয়া হল যে, তুমি কখনও ক্ষুধার্ত হবে না (যদ্দরুন কষ্ট হবে অথবা তা উপার্জনে বিলম্ব ও পেরেশানী হবে।) এবং উলঙ্গ হবে না (যে কাপড় পাবে না কিংবা প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্বে পাবে) এবং তোমরা পিপাসিতও হবে না (যে, পানি পাবে না কিংবা দেরীতে পাওয়ার কারণে কষ্ট হবে) এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না। (কেননা জান্নাতে, রোদ্র নেই এবং গৃহও সুরক্ষিত আশ্রয়-স্থল। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গেলে এ সমস্ত বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুব হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকবে।) অতঃ-পর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনের (বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) বৃক্ষের কথা বলে দেব) এটা আহার করলে চিরকাল প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে) এবং এমন রাজত্বের কথা, যাতে কখনও দুর্বলতা আসবে না? অতঃপর (তার কুমন্ত্রণায় পড়ে) উভয়েই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল আহার করল, তখন (অর্থাৎ আহার করতেই) তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়েই (বৃক্ষের) পত্র (দেহে) জড়াতে লাগল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্য হল, ফলে, সে (জান্নাতে চিরকাল বসবাসের লক্ষ্য অর্জনে) ভ্রান্তিতে নিপতিত হল। এরপর (যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল, তখন) তার পালনকর্তা তাকে (আরও অধিক) মনোনীত করলেন, তার প্রতি (মেহেরবানীর) দৃষ্টি দিলেন এবং সৎপথে সর্বদা কায়েম রাখলেন। (ফলে এমন ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। নিষিদ্ধ বৃক্ষ আহার করার পর) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমরা উভয়েই জান্নাত থেকে নেমে যাও (এবং দুনিয়াতে তোমাদের সন্তান-সন্ততি) একে অপরের শত্রু হবে। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়ত (অর্থাৎ রসূল অথবা কিতাব) আসে,

তখন যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে) পথভ্রষ্ট হবে না এবং (পরকালে) কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার উপদেশের প্রতি বিমুখ হবে, তার জন্য (কিয়ামতের পূর্বে এবং কবরে) সংকীর্ণ জীবন হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় (কবর থেকে) উত্থিত করব। সে (বিস্মিত হয়ে) বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো (দুনিয়াতে) চক্ষুষ্মান ছিলাম। (আমি এমন কি অপরাধ করলাম?) আল্লাহ্ বললেনঃ (তোমার যেমন শাস্তি হয়েছে) এমনিভাবে (তোমা দ্বারা কাজ হয়েছে এই যে, তোমার কাছে পয়গম্বর ও উলামায়ে দীনের মাধ্যমে) আমার নির্দেশাবলী এসেছিল, তখন তুমি এগুলোর প্রতি খেয়াল করনি। এমনিভাবে আজ তোমার প্রতি খেয়াল করা হবে না। (এই শাস্তি যেমন কর্মের সাথে সম্বন্ধ রেখে দেয়া হয়েছে) এমনিভাবে আমি (প্রত্যেক) সে ব্যক্তিকে (কর্মের অনুরূপ) শাস্তি দেব, যে (আনুগত্যের) সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। বাস্তবিকই পরকালের আযাব কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী। (এর শেষ নেই। অতএব এই আযাব থেকে আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রয়োজন)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**পূর্বাপর সম্পর্কঃ** এখান থেকে হযরত আদম (আ)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহ্ফে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছেঃ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবুয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আ)-র বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রিসালত ও নবুয়তের উচ্চমর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে

মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا —এখানে عهدنا শব্দটি امرنا অথবা وصينا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।—(বাহরে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আ)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে نسيان ও عزم লক্ষণীয় نسيان শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনবধান হওয়া এবং عزم এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এই শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গম্বরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আ) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয় নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছেঃ رفع عن امتى الخطا والنسيان অর্থাৎ আমার উম্মতের গোনাহ্ ভুলবশত মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কোরআন পাক বলেঃ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন না; কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) এ কথাটিই এভাবে বলেছেনঃ حسنات الابرار سيئات المقربين —অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গোনাহ্ গণ্য করা হয়।

আদম (আ)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরদের কাছ থেকে গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের

কতক আলিমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গোনাহ্ নয়। কিন্তু আদম (আ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্য গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عصيان (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عزم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আ)-এর মধ্যে عزم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়। والله اعلم

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ—আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল ঃ আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন ঃ দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى—অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تَشْقٰى শব্দটি شَقَاوَة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ—এক পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হল ইহলৌকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয়

অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র)-র তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ هو ان يا كل من كد يده অর্থাৎ এখানে شقاوت এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা।—(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ; অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমনসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর ওপর মানব-জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তফসীর-বিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فتشقى শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন ঃ যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরী করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আ) রুটি তৈরী করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। আদম (আ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেন ঃ হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

**স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব ঃ** আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন ঃ عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة—অর্থাৎ শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়! কিন্তু আয়াতের শেষে فتشقى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فتشقيا বলা হত। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়,

তা এককভাবে স্বামী করবে। এ কারণেই فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আ)-কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

**মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে ঃ** কুরতুবী বলেন ঃ এ আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ—অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে ; যেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারক হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকাহ্‌গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে।

اَنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى—জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না" —এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না। বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى থেকে فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ—এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গোনাহ্। আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ্ কিরূপে করলেন? অথচ সাধারণ আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহ্ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাকারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে আদম (আ) সম্পর্কে প্রথমে عَصٰى ও পরে

غوى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আ)-এর এই কর্ম গোনাহ্ ছিল না; কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্‌র নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غوى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং দুই, পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ আদম (আ) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকী রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

**পয়গম্বরদের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ---তাদের সম্মানের হিফাযত ঃ**

কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী আহকামুল কোরআন গ্রন্থে عصى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই---

لا يجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه في اثناء قوله تعالى عنه اوقول نبيه فاما ان يبتدى ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في ابائنا الادنين الينا المماثلين لنا فكيف في ابينا الاقدم الاعظم الاكرم النبي المقدم الذى عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله -

আজ আমাদের কারও জন্য আদম (আ) কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ্ যার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্য কোন অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবু নছর বলেন ঃ কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আ)-কে গোনাহ্‌গার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েয নয়। কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। ---(কুরতুবী)

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا -- অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা অবান্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলা বাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي — এখানে যিকর-এর অর্থ কোরআনও হতে পারে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَسُولًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা রসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কোরআনের তিলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তার পরিণাম এই: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ — অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কিয়ামতে হবে।

**কাফির ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ:** এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সা) বলেন: পয়গম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালামুসীবত সবচাইতে বেশী কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফির ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান

কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মসনদ বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর তফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে।

—(মাযহারী)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।—(মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ
مَسٰكِنِهِمْ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ أَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا
يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ج
وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ
لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ أَبْقٰى ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَ قَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ
مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ
لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ

أَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ
مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

(১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাস-ভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশে ও দিবাভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (১৩৩) এরা বলে ঃ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতি-পূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(এ অভিযোগকারীগণ যারা মুখ ফেরানো থেকে বিরত হচ্ছে না, তবে) এদের কি এ থেকেও হেদায়েত হল না যে, আমি এদের পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে (এই মুখ ফেরানোর কারণেই আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। তাদের (কিছু সংখ্যকের) বাস-ভূমিতে এরাও বিচরণ করে (কেননা, মক্কাবাসীদের সিরিয়া যাওয়ার পথে কোন কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের বাসভূমি পড়ত)। এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে) তো বুদ্ধি-মানদের (বোঝার) জন্য (মুখ ফেরানোর অশুভ পরিণতির পর্যাপ্ত) প্রমাণাদি রয়েছে।

(এদের ওপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে এরা মনে করে যে, এদের ধর্ম নিন্দনীয় নয়। এর স্বরূপ এই যে) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্ব থেকে বলা না হয়ে থাকলে (তা এই যে, কোন কোন উপকারিতার কারণে তাদেরকে সময় দেয়া হবে) এবং (আযাবের জন্য) একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে (এবং সেই সময়কাল হচ্ছে কিয়ামতের দিন। তাদের কুফর ও মুখ ফেরানোর কারণে) আযাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (মোটকথা এই যে, কুফর তো আযাবই চায়; কিন্তু একটি অন্তরায়ের কারণে আযাবে বিরতি হচ্ছে। কাজেই তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে তারা যে নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে করে, এটা ভুল। এখানে সময় দেয়া হচ্ছে ছেড়ে দেয়া হয় নি।) সুতরাং (আযাব যখন নিশ্চিত, তখন) আপনি তাদের (কুফর মিশ্রিত) কথাবার্তায় সবর করুন (এবং "আল্লাহর ব্যাপারে শত্রুতা" এই নীতির কারণে তাদের প্রতি যে ক্রোধ হয়, তা এবং আযাবের বিলম্বের কারণে মনে যে অস্থিরতা হয়, তা বর্জন করুন) এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসা (ও গুণ) সহকারে (তাঁর) পবিত্রতা পাঠ করুন---(এতে নামাযও এসে গেছে।) সূর্যোদয়ের পূর্বে (যেমন ফজরের নামায), সূর্যাস্তের পূর্বে (যেমন যোহর ও আসরের নামায) এবং রাত্রিকালেও পাঠ করুন (যেমন মাগরিব ও এশার নামায) এবং দিনের শুরুতে ও শেষে (পবিত্রতা পাঠ করার জন্য গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলা হচ্ছে। ফলে গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে ফজর ও মাগরিবের উল্লেখও পুনরায় হয়ে গেল।) যাতে আপনি (সওয়াব পাওয়ার কারণে) সন্তুষ্ট হন। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্যিকার মা'বুদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন ---মানুষের চিন্তা করবেন না।) আপনি ঐ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি) যা আমি কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (উদাহরণত ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে) পরীক্ষা করার জন্য (নিছক) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ দিয়ে রেখেছি। (উদ্দেশ্য অন্যদেরকে শোনানো যে, নিষ্পাপ নবীর জন্যও যখন এটা নিষিদ্ধ, অথচ তাঁর মধ্যে পাপের সম্ভাবনাও নেই, তখন যারা নিষ্পাপ নয় তাদের জন্য এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া কিরূপে জরুরী হবে না। পরীক্ষা এই যে, কে অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং কে অবাধ্যতা করে) আপনার পালনকর্তার দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে) অনেক গুণে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী (কখনও ক্ষয় হবে না। সারকথা এই যে, তাদের মুখ ফেরানোর প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের প্রতিও দৃষ্টি দেবেন না। সবগুলোর পরিণাম আযাব।) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ পরিবারের লোকদেরকে অথবা মু'মিনদেরকে)-ও নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এতে অবিচল থাকুন। (অর্থাৎ এ বিষয়টি হচ্ছে অধিক মনোযোগদানের যোগ্য) আমি আপনার দ্বারা (এমনিভাবে অন্যদের দ্বারা) এমন জীবিকা (উপার্জন করাতে) চাই না যা জরুরী ইবাদতের পথে বাধা হয়ে যায়। (জীবিকা তো আপনাকে এবং এমনিভাবে অন্যদেরকে) আমি দেব। (অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য উপার্জন নয়---ধর্ম ও ইবাদত। উপার্জনের তখনই অনুমতি অথবা আদেশ আছে, যখন তা জরুরী ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে)। আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (তাই আমি لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا এবং وَأْمُرْ أَهْلَكَ ইত্যাদি নির্দেশ দেই। এবং

অভিযোগকারীদের কিছু অবস্থা ও উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের আরও একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।) তারা (হঠকারিতাবশত) বলেঃ রসূল আমাদের কাছে (নবুয়তের) কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? (উত্তর এই যে) তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পৌঁছে নি? (এতে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কোরআন দ্বারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কাছে কি কোরআন পৌঁছে নি, পূর্ব থেকেই যার খ্যাতি রয়েছে? এটাই নবুয়তের পর্যাপ্ত দলীল।) যদি আমি তাদেরকে কোরআন আসার পূর্বে (কুফরের কারণে) কোন আপদ দ্বারা ধ্বংস করতাম) এবং এরপর কিয়ামতের দিন আসল শাস্তি দিতাম) তবে তারা (ওযর পেশ করে) বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে কোন রসূল (দুনিয়াতে) কেন প্রেরণ করেন নি? তাহলে আমরা (এখানে নিজেরা) হেয় এবং (অপরের দৃষ্টিতে) অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার বিধানাবলী মেনে চলতাম। (সুতরাং এখন এই ওযরেরও অবকাশ রইল না। তারা যদি বলে যে, এই আযাব কবে হবে, তবে) বলুনঃ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি, অতএব (কিছুদিন) আরও প্রতীক্ষা করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা (ও) জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে (মঞ্জিলে) মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে (অর্থাৎ এই ফয়সালা সত্বরই মৃত্যুর পর অথবা হাশরের পর প্রকাশ হয়ে পড়বে)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ—يهد ক্রিয়াপদের فاعل-এর ضمير—هدى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هدى দ্বারা কোরআন অথবা রসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেন নি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেন নি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فاعل-এর ضمير আল্লাহ্র দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দেন নি।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ—মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ যাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক, আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, বরং সবর করবেন। দুই, আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ—বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

**শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল হওয়া ঃ** এ জগতে ছোট-বড়, ভালমন্দ কোন মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে; যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। এক, সবর; অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। দুই, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সব কাজ রহস্যের ওপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে; তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكَ تَرْضٰى অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ—অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার অথবা ইবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَبِّحْ بِحَمْدِ—শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামায, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' বলে যোহর ও আসরের নামায এবং مِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ—বলে রাত্রিকালীন সব নামায মাগরিব, এশা, তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর اَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, বরং মু'মিনের জন্য আশংকার বস্তু ঃ ولا تمدن عينيك----এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু আসলে উম্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফির ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমক সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন? হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মত মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রসূলে করীম (সা) তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত উমর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরী মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত উমর কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহ্‌র মনোনীত ও প্রিয় রসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে খাত্তাব-তনয়, তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছ? এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোন অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আযাবই আযাব। মু'মিনদের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা) পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম-আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তাঁর ছিল। কোন সময় পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং নিজে আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম আবূ সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان اخوف ما اخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا

আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশংকা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে।

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশংকার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর বিধানাবলী থেকে গাফিল হয়ে যেতে পার।

**পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্য ঃ** وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। এক, পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং দুই, নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরাপুরি অব্যাহত রাখার জন্যও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যক। কেননা, পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই اَهْل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-র গৃহে গমন করে الصلوٰة الصلوٰة (নামায পড়, নামায পড়) বলতেন।---(কুরতুবী)

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের ওপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত উমর ফারূক (রা) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।---(কুরতুবী)

**যে ব্যক্তি নামায ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তার রিযিকের ব্যাপার সহজ করে দেন ঃ** لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ——অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিযিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিযিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশির মধ্যে মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু বীজের ভেতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাযত ও আল্লাহ্ সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার

জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়া-য়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يقول الله تعالى يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املاء صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل ملاءت صدرك شغلا ولم اسد فقرك -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ-লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে)।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি ঃ

من جعل همومه هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اى اودية هلك

যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ্ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার-চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয়, সে এসব চিন্তার যে কোন জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। (ইবনে কাসীর)

بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى—অর্থাৎ তওরাত, ইনজীল ও ইবরাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى—অর্থাৎ—আজ তো আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌র কাছে কোন্‌টি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।

اللهم اهدنا لما اختلف فيه الى الحق باذنك ولا حول ولا قوة الا بك ولا ملجاء ولا منجاء منك الا اليك -

আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি ১৪ যিলহজ্জ ১৩৯০ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় আমাকে সূরা তোয়া-হা সমাপ্ত করার তওফীক প্রদান করেছেন। মহিমময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাকে কোরআনের অবশিষ্ট অংশেরও তফসীর সম্পন্ন করার তওফীক প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সকল প্রকার সাহায্যের জন্য স্মরণকেই এবং তারই ওপর একান্তে নির্ভরশীল থাকি।

سورة الانبياء

# সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১২২ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ
ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ
وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ
السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣ قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ
افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥ مَآ
اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ وَمَآ
اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ
وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ
وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠

পরম করুণাময় ও দয়াল আল্লাহ্‌র নামে।

(১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন

উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে, 'সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড়?' (৪) পয়গম্বর বললেন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে ঃ অলীক স্বপ্ন; না---সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না---সে একজন কবি। অতএব সে আমাধের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এখন এরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে? (৭) আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালংঘনকারীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

এসব (অবিশ্বাসী) মানুষের হিসাবের সময় তাদের নিকটে এসে গেছে অর্থাৎ কিয়ামত ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে) এবং তারা (এখনও) অমনোযোগিতায় (ই পড়ে) আছে (এবং তা বিশ্বাস করা থেকেও তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। (তাদের গাফিলতি এতদূর গড়িয়েছে যে) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন (তাদের অবস্থানুযায়ী) উপদেশ আসে, (সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে) তারা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর গোড়া থেকেই এদিকে) মনোযোগী হয় না। অর্থাৎ জালিম (ও কাফির)-রা (পরস্পরে) গোপনে গোপনে [পরামর্শ করে (মুসলমানদের ভয়ে নয়; কারণ মক্কার কাফিররা দুর্বল ছিল না; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য) সে [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)] নিছক তোমাদের মত একজন (মামুলী) মানুষ (অর্থাৎ নবী নয়। সে যে চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর কালাম শোনায়, তাকে অলৌকিক মনে করো না এবং এ অলৌকিকতার কারণে তাকে নবী বলে ধারণা করো না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে যাদুমিশ্রিত কালাম।) অতএব (এতদসত্ত্বেও) তোমরা কি যাদুর কথা শোনার জন্য (তার কাছে) যাবে, অথচ তোমরা (এ বিষয়টি খুব) জান (বোঝ)? পয়গম্বর (জওয়াব দেওয়ার আদেশ পেলেন এবং তিনি আদেশ অনুযায়ী জওয়াবে) বললেন ঃ আমার পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কথা (প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য) ভালোভাবে জানেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (অতএব তোমাদের এসব কুফুরী কথাবার্তাও জানেন এবং

তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারা সত্য কালামকে শুধু যাদু বলেই ক্ষান্ত হয় নি;) বরং তারা আরও বলে, (এই কোরআন) অলীক কল্পনা (বাস্তবে চিত্তাকর্ষকও নয়) বরং (তদুপরি) সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) একে (ইচ্ছাকৃতভাবে মন থেকে) উদ্ভাবন করেছে (স্বপ্নের কল্পনায় তো মানুষ কিছুটা অক্ষম, ক্ষমার্হ ও সংশয়ে পতিতও হতে পারে। এই মিথ্যা উদ্ভাবন শুধু কোরআনেই সীমিত নয়) বরং সে একজন কবি। (তার সব কথাবার্তা এমনি রকম মনগড়া ও কাল্পনিক হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, সে রসূল নয়; অথচ রসূল হওয়ার জোর দাবি করে।) অতএব সে কোন (বড়) নিদর্শন আনুক; যেমন পূর্ববর্তীদেরকে রসূল করা হয়েছিল (এবং তারা বড় বড় মু'জিযা জাহির করেছিলেন। তখন আমরা তাকে রসূল বলে মেনে নেব এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। তাদের একথা বলাও একটি বাহানা ছিল। তারা তো পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও মানত না। আল্লাহ্ তা'আলা জওয়াবে বলেন ঃ) তাদের পূর্বে যেসব জনপদবাসিগণকে আমি ধ্বংস করেছি (তাদের ফরমায়েশী মু'জিযা জাহির হওয়া সত্ত্বেও) তারা বিশ্বাস স্থাপন করে নি, এখন তারা কি (এসব মু'জিযা জাহির হলে পরে) বিশ্বাস স্থাপন করবে? (এমতাবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করলে আযাব এসে যাবে। তাই আমি এসব মু'জিযা জাহির করি না এবং কোরআনরূপী মু'জিযাই যথেষ্ট। রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এই যে, রসূল মানুষ হওয়া উচিত নয়। এর জওয়াব এই যে) আপনার পূর্বে আমি কেবল মানুষকেই পয়গম্বর করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। অতএব (হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়) তোমরা যদি না জান, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (কেননা তারা যদিও কাফির, কিন্তু মুতাওয়াতির সংবাদে বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। এছাড়া তোমরা তাদেরকে মিত্র মনে কর। কাজেই তোমাদের কাছে তাদের সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত।) আর (এমনিভাবে রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহের অপর পিঠ ছিল এই যে, রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে) আমি রসূলদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না (অর্থাৎ ফেরেশতা করি নি) এবং [তারা যে আপনার ওফাতের অপেক্ষায় আনন্দ উল্লাস করছে যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ [মায়ালেম], এই ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা] তাঁরা (অতীত পয়গম্বরগণও) চিরস্থায়ী ছিলেন না। (সুতরাং আপনারও ওফাত হয়ে গেলে নবুয়তের মধ্যে কি অভিযোগ আসতে পারে? মোটকথা, পূর্ববর্তী রসূলগণ যেমন ছিলেন, আপনিও তেমন। তারা যেমন আপনাকে মিথ্যারোপ করে, তেমনি তাদেরকেও তখনকার কাফিররা মিথ্যারোপ করেছে।) অতঃপর আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম (যে, মিথ্যারোপকারীদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করব এবং তোমাদেরকে ও মুমিনদেরকে রক্ষা করব, আমি) তা পূর্ণ করলাম অর্থাৎ তাদেরকে এবং যাদেরকে (রক্ষা করার) ইচ্ছা ছিল, (আযাব থেকে) রক্ষা করলাম এবং (আযাব দ্বারা) সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। (অতএব এদের সতর্ক হওয়া উচিত। হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, এই মিথ্যারোপের পর তোমাদের ওপর ইহকালে ও পরকালে আযাব আসা বিচিত্র নয়; কেননা) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে

তোমাদের জন্য ( যথেষ্ট ) উপদেশ রয়েছে। ( এমন উপদেশ প্রচার সত্ত্বেও ) তোমরা কি বোঝ না ( এবং মেনে চল না )?

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**সূরা আম্বিয়ার ফযীলত ঃ** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সূরা কাহ্ফ, মারইয়াম, তোয়া-হা ও আম্বিয়া—এই চারটি সূরা প্রথম ভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হিফাযত করি। —( কুরতুবী )

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ —অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ—যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশংকার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সব গাফিলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা, একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের ভিত্তি।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ —যারা পরকাল ও কবরের আযাব থেকে গাফিল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা করতে থাকে।

أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ—অর্থাৎ তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে: এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতই মানুষ—কোন ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র যে কালাম পাঠ করা হত, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফিরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে যাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা যাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ—যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে أحلام বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ 'অলীক কল্পনা' করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে যাদু বলেছে; এরপর তারও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ—অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্খিত মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করে নি। প্রার্থিত মু'জিযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ্‌র আইন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে আযাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফিরদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি চাওয়া মু'জিযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মু'জিযা প্রদর্শন করা হয় না।

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ এখানে أهل الذكر (যাদের স্মরণ আছে) বলে তওরাত ও ইনজীলের যেসব আলিম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন—না ফেরেশতা ছিলেন, এ কথা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে তওরাত ও ইঞ্জীলের আলিমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে اهل الذكر দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদী ও খৃস্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই ঐ ব্যাপারের সাক্ষ্যদাতা। তফসীরের সার সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**মাস'আলা ঃ** তফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়ত বিধি-বিধান জানে না, এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলিমদের অনুসরণ করা। তারা আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করবে।

**কুরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু ঃ** كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

কিতাব অর্থ কোরআন এবং যিকর অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ কোরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে কোরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং শুধু কোরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কোরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

---

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا
قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَأْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾
لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾
قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ
حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾

---

**(১১) আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। (১২) অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল। (১৩) পলায়ন করো না এবং ফিরে এস, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে;**

সম্ভবত কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। (১৪) তারা বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (১৫) তাদের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আমি অনেক জনপদ, যেগুলোর অধিবাসীরা জালিম (অর্থাৎ কাফির) ছিল, ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর যখন জালিমরা আমার আযাব আসতে দেখল, তখন জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগল (যাতে আযাবের কবল থেকে বেঁচে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ) পলায়ন করো না এবং নিজেদের বিলাস সামগ্রী ও বাসগৃহে ফিরে চল। সম্ভবত কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে (যে, তোমাদের কি হয়েছিল? উদ্দেশ্য হলো, ইঙ্গিতে তাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধৃষ্টতার জন্যে হুঁশিয়ার করা যে, যে সামগ্রী ও বাসগৃহ নিয়ে তোমরা গর্ব করতে এখন সেই সামগ্রীও নেই, বাসগৃহও নেই এবং কোন সহানুভূতিশীল মিত্রের নাম-নিশানাও নেই।) তারা (আযাব নাযিল হওয়ার সময়) বলল ঃ হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই জালিম ছিলাম। তাদের এই আর্তনাদ অবিচ্ছিন্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে এমন (নেস্তনাবুদ) করে দিলাম, যেন কর্তিত শস্য অথবা নির্বাপিত অগ্নি।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

কোন কোন তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একজন রসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুআয়ব বলা হয়েছে। শুআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শুআয়ব (আ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্র রসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফির বাদশাহ্ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বনী ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের ওপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

---

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ
نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝ بَلْ
نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۭ وَلَكُمُ

الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ
عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾
يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً
مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ
لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾
لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا
فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ
مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ
ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ
اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

(১৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া-উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়,

অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুর্ভোগ। (১৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) তারা রাতদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (২১) তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহণ করেছে যে, তারা তাদেরকে জীবিত করবে? (২২) যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। (২৩) তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (২৪) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে। (২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলল ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তার জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তার সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(আমি যে অদ্বিতীয়, আমার সৃষ্ট বস্তুই তার প্রমাণ। কেননা,) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (বরং এগুলোর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে বড় রহস্য হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদের প্রমাণ।) যদি ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য হত, (যার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য উপকার উদ্দিষ্ট থাকে না—শুধু চিত্তবিনোদনই লক্ষ্য থাকে) তবে বিশেষভাবে আমার কাছে যা আছে, তাকেই আমি তা করতাম (উদাহরণত আমার পূর্ণত্বের গুণাবলীর প্রত্যক্ষকরণ) যদি আমাকে করতে হত। (কেননা ক্রীড়াকারীর অবস্থার সাথে ক্রীড়ার মিল থাকা আবশ্যক। কোথায় সৃষ্টির স্রষ্টার সত্তা এবং কোথায় নিত্য সৃষ্ট বস্তু। তবে গুণাবলী অনিত্য এবং সত্তার জন্যে অপরিহার্য হওয়ার কারণে সত্তার সাথে মিল রাখে। যখন যুক্তিগত প্রমাণ ও সকল ধর্মাবলম্বীদের ঐকমত্যে গুণাবলীও ক্রীড়া হতে পারে না, তখন নিত্য সৃষ্ট বস্তু কে হতে পারবে না—এতে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আমি ক্রীড়াচ্ছলেও অনর্থক সৃষ্টি করিনি।) বরং (সত্যকে প্রমাণ ও মিথ্যাকে বাতিল করার জন্যে সৃষ্টি করেছি,) আমি সত্যকে (যার প্রমাণ সৃষ্ট বস্তু) মিথ্যার ওপর

(এভাবে প্রবল করি, যেমন মনে কর যে, আমি একে তার ওপর) নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ করে (অর্থাৎ মিথ্যাকে পরাভূত করে দেয়) সুতরাং তা (অর্থাৎ মিথ্যা পরাভূত হয়ে) তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু থেকে অর্জিত তওহীদের প্রমাণাদি শিরকের সম্পূর্ণ মুণ্ডপাত করে দেয় এবং বিপরীত দিকের সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তোমরা যে এসব শক্তিশালী প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শিরক কর,) তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, তোমরা (সত্যের বিরুদ্ধে) যা মনগড়া কথা বলছ, তার কারণে। (আল্লাহ্ তা'আলার শান এই যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা রয়েছে, তারা তাঁর (মালিকানাধীন) আর (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্র কাছে (খুব প্রিয় ও নৈকট্যশীল) রয়েছে (তাদের ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তারা তাঁর ইবাদতে লজ্জাবোধ করে না এবং ক্লান্ত হয় না। (বরং) রাতদিন (আল্লাহ্র) পবিত্রতা বর্ণনা করে, (কোন সময়) বিরত হয় না। (তাদের যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ সৃষ্ট জীব কোন্ কাতারে? সুতরাং ইবাদতের যোগ্য তিনিই। অন্য কেউ যখন এরূপ নয়, তখন তাঁর শরীক বিশ্বাস করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতা! তওহীদের এসব প্রমাণ সত্ত্বেও) তারা কি বিশেষত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে পৃথিবীর বস্তুসমূহের মধ্য থেকে (যা আরও নিকৃষ্টতর ও নিম্নস্তরের; যথা পাথর ও ধাতব মূর্তি) যা কাউকে জীবিত করবে? (অর্থাৎ যে বস্তু প্রমাণও দিতে পারে না, এরূপ অক্ষম কিরূপে উপাস্য হওয়ার যোগ্য হবে? নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য হত, তবে উভয়ই (কবে) ধ্বংস হয়ে যেত। (কেননা, স্বভাবতই উভয়ের সংকল্প ও কাজে বিরোধ হত এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ হত। এমতাবস্থায় ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু বাস্তবে ধ্বংস হয়নি। তাই একাধিক উপাস্যও হতে পারে না।) অতএব (এ থেকে প্রমাণিত হল যে,) তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। (নাউযুবিল্লাহ্, তারা বলে, তাঁর অন্যান্য শরীকও রয়েছে। অথচ তাঁর এমন মাহাত্ম্য যে,) তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তাঁকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না এবং অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সুতরাং মাহাত্ম্যে তাঁর কেউ শরীক নেই। এমতাবস্থায় উপাস্যতায় কেউ কিরূপে শরীক হবে? এরপর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে আলোচনা করা হচ্ছে,) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? (তাদেরকে) বলুন ঃ (এ দাবীর ওপর) তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। (এ পর্যন্ত প্রশ্ন ও যুক্তিগত প্রমাণের মাধ্যমে শিরক বাতিল করা হয়েছে। অতঃপর ইতিহাসগত প্রমাণের মাধ্যমে বাতিল করা হচ্ছে) এটা আমার সঙ্গীদের কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) এবং আমার পূর্ববর্তীদের কিতাবে (অর্থাৎ তওরাত, ইনজীল ও যবূরে) বিদ্যমান রয়েছে। (এগুলো যে সত্য ও ঐশী গ্রন্থ, তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত। অন্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হলেও কোরআনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এসব কিতাবের যে বিষয়বস্তু কোরআনের অনুরূপ হবে, তা নিশ্চিতই বিশুদ্ধ হবে। তওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যাওয়াই উল্লেখিত প্রমাণাদির দাবী ছিল, কিন্তু এরপরও তারা বিশ্বাসী হয়নি।) বরং তাদের অধিকাংশই সত্য বিষয়ে বিশ্বাস করে না। অতএব (এ কারণে) তারা (তা কবুল করতে) বিমুখ হচ্ছে। (তওহীদ কোন নতুন বিষয়

নয় যে, তার প্রতি পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে; বরং একটি প্রাচীন পন্থা। সেমতে) আপনার পূর্বে আমি এমন কোন পয়গম্বর পাঠাইনি, যাকে এরূপ ওহী প্রেরণ করিনি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। তারা (অর্থাৎ কতক মুশরিক) বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) সন্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন। (তওবা, তওবা) তিনি (এ থেকে) পবিত্র। তারা (ফেরেশতারা তাঁর সন্তান নয়,) বরং (তাঁর) সম্মানিত বান্দা। (এ থেকেই নির্বোধদের ধাঁধাঁ লেগেছে। তাদের দাসত্ব, গোলামী ও শিষ্টাচার এরূপ যে,) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না (বরং আদেশের অপেক্ষায় থাকে) এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। (বিপরীত করতে পারে না। কেননা, তারা জানে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতের অবস্থাদি (ভালোভাবে) জানেন। কাজেই তাঁর যে আদেশ হবে এবং যখন হবে, রহস্য অনুযায়ী হবে। তাই তারা কার্যত বিরোধিতা করে না এবং কথা বলায় আগে বাড়ে না। তাদের শিষ্টাচার এরূপ যে,) যার জন্যে সুপারিশ করার ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলার আছে, তারা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করতে পারে না। তারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে। (এ হচ্ছে তাদের দাসত্ব ও গোলামীর বর্ণনা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রবলত্ব ও প্রভুত্ব বর্ণিত হচ্ছে যদিও উভয়ের সারমর্ম কাছাকাছি। অর্থাৎ) তাদের মধ্যে যে (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালিমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ তাদের ওপর আল্লাহ্র পূর্ণ আধিপত্য আছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্ট জীবের ওপর আছে। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্র সন্তান কিরূপে হতে পারে)?

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ—অর্থাৎ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এ সব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি?

لَاعِبِينَ—শব্দটি لعب ধাতু থেকে উদ্ভূত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে لعب

বলা হয়। ---(রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لهو বলা হয়। ইসলামবিরোধীরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবী করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্ট কর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী। কবি বলেন ঃ

هر گیاهے کہ از زمین روید
وحدہ لا شریک لہ گوید

অর্থাৎ ঃ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস 'ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু' বলে থাকে।

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হত, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবী ভাষায় لَوْ শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لو শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা ঊর্ধ্বজগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং-তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভালবিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়---আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক ঊর্ধ্বে।

لهو শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ لهو শব্দটি কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খৃস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। والله اعلم

قذف—بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يدمغ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زاهق—এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের ওপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ—অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতা), তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক, কারও ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই, ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দু'টি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাতদিন তসবীহ্ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করে না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস বলেনঃ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম ঃ তসবীহ্ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বললেন ঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। (কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ---এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এক. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্ট জীবকেই উপাস্য করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টি জীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হেয়। দুই. যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। সৃষ্ট জীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ---এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই আল্লাহ্ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পসন্দ করবে, অন্যজনও তাই পসন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ্ চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ্ চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ্ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ্ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়েই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ্ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ আয়াতেও এ দিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ্ হতে পারে না। আল্লাহ্ তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ্ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ্র পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي---এর এক অর্থ তফসীরের সার-

সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, ذكر من معى বলে কোরআন এবং ذكر من قبلى বলে তওরাত, ইন্‌জীল, যবূর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইন্‌জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইনজীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিসসা-কাহিনী জীবিত আছে।

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ---অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ্‌র সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا
سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ
وَهُمْ عَنْ آيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

(৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে

সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

কাফিররা কি জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী (পূর্বে) বন্ধ ছিল (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি হত না এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল উৎপন্ন হত না। একেই 'বন্ধ' বলা হয়েছে; যেমন আজও কোন স্থানে অথবা কোনকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল না হলে সে স্থানে অথবা সেকালের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে বন্ধ বলা হয়।) অতঃপর আমি উভয়কে (স্বীয় কুদরতে) খুলে দিলাম। (ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে বৃক্ষ গজানো শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি দ্বারা শুধু বৃক্ষই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; বরং আমি (বৃষ্টির) পানির থেকে প্রত্যেক প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বে পানির প্রভাব অনস্বীকার্য প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে; যেমন অন্য আয়াতে আছে وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) তারা কি এরপরও (অর্থাৎ এসব কথা শুনেও) বিশ্বাস স্থাপন করে না। আমি (স্বীয় কুদরতে) পৃথিবীতে পাহাড় এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে হেলতে না থাকে এবং আমি তাতে (পৃথিবীতে) প্রশস্ত পথ করেছি, যাতে তারা (এগুলোর মাধ্যমে) গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। আমি (স্বীয় কুদরতে) আকাশকে (পৃথিবীর বিপরীতে তার উপরে) এক ছাদ (সদৃশ) করেছি, যা (সর্বপ্রকারে) সুরক্ষিত (অর্থাৎ পতন, ভেঙ্গে যাওয়া এবং শয়তানের সেখানেই পৌঁছে আকাশের কথা শোনা থেকে সুরক্ষিত। কিন্তু আকাশের এই সুরক্ষিত হওয়া চিরস্থায়ী নয়---নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।) অথচ তারা (আকাশস্থিত) নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে না।) তিনি এমন (সক্ষম) যে, তিনি রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন (এগুলোই আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে (এভাবে বিচরণ করে যেন) সাঁতার কাটছে।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا—এখানে رويت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে

দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়-বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا—رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয় এবং فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رتق ও فتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া' ও 'খুলে দেয়ার' অর্থ কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণ যে উক্তি গ্রহণ করেছেন, তা-ই তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَتَقْنَا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অংকুরিত হত না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর নিয়ে হযরত ইবনে উমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে উমর তফসীর শুনে বললেন ঃ এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পসন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন; তিনি رتق ও فتق এর নির্ভুল তফসীর করেছেন।

রূহুল মা'আনীতে ইবনে আব্বাসের এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনযির, আবূ নু'আয়ম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলেছেন।

ইবনে আতিয়্যা আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এই তফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং

পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ বলা হয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত তফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে ইকরামার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়; অর্থাৎ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ তাবারীও এই তফসীর গ্রহণ করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ----অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলা বাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আহ্‌মদের সনদ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (স)-র কাছে আরয করলাম; "ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জওয়াবে তিনি বললেন ঃ "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।" এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ "আমাকে এমন কাজ বলে দিন, যা করে আমি জান্নাতে পৌঁছে যাই। তিনি বললেন ঃ

افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام ثم ادخل الجنة بسلام -

অর্থাৎ ব্যাপক হারে সালাম কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও (হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফির ফাসিক প্রত্যেককে আহার করালেও সওয়াব পাওয়া যাবে।) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামায পড়। এরূপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ----আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক

আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীরে কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুল কোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-ও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন।

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ - প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فلكة المغزل বলা হয়। (রূহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয় নি যে, এই কক্ষ-পথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ
الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُم
بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ
آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ
النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِم
بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا

مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَ
النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَمْ
لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَ
لَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٣٦﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ
الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٧﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ
الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ
رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ
الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ
حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٠﴾

(৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬) কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারাই তো 'রহমান'-এর আলোচনায় অস্বীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলেঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯) যদি কাফিররা ঐ সময়টি জানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না! (৪০) বরং তা আসবে তাদের ওপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের ওপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুনঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে

হিফাযত করবে রাতে ও দিনে? বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেবদেবী আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মুকাবিলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) বলুন ঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি; কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। (৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম'। (৪৭) আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(কাফিররা আপনার ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। কারণ, তারা বলত نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ---আপনার এ ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কেননা) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। (আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ ---সুতরাং আপনার পূর্বে যেমন পয়গম্বরদের মৃত্যু হয়েছে এবং এতে তাদের নবুয়তে কোন আঁচ লাগেনি, তেমনি আপনার ওফাতের কারণেও আপনার নবুয়তে কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না। সারকথা এই যে, নবুয়ত ও ওফাত উভয়ই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে।) অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কি তারা চিরজীবী হয়ে থাকবে? (শেষে তারাও মরবে। কাজেই আনন্দিত হওয়ার কি যুক্তি আছে? উদ্দেশ্য এই যে, আপনার ওফাতের কারণে তাদের আনন্দ যদি নবুয়ত বাতিল হবার উদ্দেশ্যে হয়, তবে مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ আয়াতটি এর জওয়াব। পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শত্রুতাবশত হয়, তবে اَفَاِنْ مِّتَّ আয়াতটি-এর জওয়াব। মোটকথা, আপনার ওফাতের অপেক্ষায় থাকা সর্বাবস্থায় অনর্থক। মৃত্যু তো এমন যে) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। (আমি যে তোমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে) আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি। ('মন্দ' বলে মেযাজ-বিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র্য ইত্যাদি এবং 'ভাল' বলে মেযাজের অনুকূল

বিষয় যেমন স্বাস্থ্য, ধনাঢ্যতা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এই অবস্থাগুলোই মানবজীবনে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এসব অবস্থায় কেউ ঈমান ও ইবাদতে কায়েম থাকে এবং কেউ কুফর ও গোনাহে লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কি কি কর্ম কর, তা দেখার জন্যই জীবন দান করেছি।) আর (এই জীবন শেষ হলে পর) আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাই হল। জীবন তো সাময়িক ব্যাপার। এর জন্যই তাদের গর্বের শেষ নেই এবং তারা পয়গম্বরের ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈমানের দৌলত উপার্জন করা তাদের দ্বারা হল না যা তাদের উপকারে আসত। তা না করে তারা স্বীয় আমলনামা তমসাচ্ছন্ন এবং পরকালের মনযিল দুর্গম করে চলেছে।) আর (এ অবিশ্বাসীদের অবস্থা এই যে) সেই কাফিররা যখন আপনাকে দেখে, তখন শুধু আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে (এবং পরস্পরে বলে) ঃ এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের (মন্দ) আলোচনা করে। (সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে তো দেবতাদেরকে অস্বীকার করারও অভিযোগ রয়েছে) এবং তারা (স্বয়ং) দয়াময় আল্লাহ্‌র আলোচনা অস্বীকার করে। (সুতরাং অভিযোগের বিষয় তো প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রমই। কাজেই তাদের উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। তারা যখন কুফরের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়-বস্তু শোনে; যেমন পূর্বে إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মিথ্যা-রোপ করার কারণে বলতে থাকে, শাস্তিটি তাড়াতাড়ি আসে না কেন? এই ত্বরা-প্রবণতা সাধারণত মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যও বটে, যেন) মানুষ ত্বরা-প্রবণই সৃজিত হয়েছে। (অর্থাৎ ত্বরা ও দ্রুততা যেন মানুষের গঠন-উপাদানের অংশ বিশেষ। এ কারণেই তারা দ্রুত আযাব কামনা করে এবং বিলম্বকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। কিন্তু হে কাফির সম্প্রদায়, এটা তোমাদের ভুল। কেননা, আযাবের সময় নির্দিষ্ট আছে। একটু সবর কর) আমি সত্বরই (আযাব আসার পর) তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ শাস্তি) দেখাব। অতএব আমাকে ত্বরা করতে বলো না। (কারণ, সময়ের পূর্বে আযাব আসে না এবং সময় হলে তা পিছু হটে না।) তারা (যখন নির্ধারিত সময়ে আযাব আসার কথা শোনে, তখন রসূল ও মুসলমানদেরকে) বলে ঃ এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? যদি তোমরা (আযাবের সংবাদে) সত্যবাদী হও, (তবে দেরী কিসের? শীঘ্র আযাব আনা হয় না কেন? প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিপদ সম্পর্কে তারা অবগত নয় বিধায় এমন নির্ভাবনার কথাবার্তা বলছে।) হায়, কাফিররা যদি ঐ সময়টি জানত, যখন (তাদেরকে চতুর্দিক থেকে দোযখের অগ্নি বেষ্টন করবে এবং) তারা সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ তাদের সাহায্যও করবে না (অর্থাৎ, এই বিপদ সম্পর্কে অবগত হলে এমন কথা বলত না। তারা যে দুনিয়াতেই জাহান্নামের আযাব চাইছে তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী জাহান্নামের আযাব আসা জরুরী নয়।) বরং সে অগ্নি তাদের ওপর অতর্কিতভাবে আসবে অতঃপর তাদেরকে হতবুদ্ধি করে

দেবে, তখন তারা তা ফেরাতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (যদি তারা বলে যে, এই আযাব পরকালে প্রতিশ্রুত হওয়ার কারণে যখন দুনিয়াতে হয় না, তখন দুনিয়াতে এর কিছুটা নমুনা তো দেখাও, তবে তর্কক্ষেত্রে যদিও নমুনা দেখানো জরুরী নয়, কিন্তু এমনিতেই নমুনার সন্ধানও দেয়া হচ্ছে। তা এই যে) আপনার পূর্বেও অনেক রসূলের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর ঠাট্টাকারীদের ওপর ঐ আযাব পতিত হল, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত (যে, আযাব কোথায়? সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, কুফর আযাবের কারণ। দুনিয়াতে না হলেও পরকালে আযাব হবে। তাদেরকে আরও) বলুনঃ কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়াময় আল্লাহ্ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব থেকে) হেফাযত করবে? (এই বিষয়বস্তুর কারণে তওহীদ মেনে নেওয়া জরুরী ছিল, কিন্তু তারা এখনও তওহীদ মানে নি।) বরং তারা (এখন পূর্ববৎ) তাদের (প্রকৃত) পালনকর্তার স্মরণ (অর্থাৎ তওহীদ মেনে নেয়া) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (হ্যাঁ, আমি مَنْ يَكْلَؤُكُمْ-এর ব্যাখ্যার জন্য পরিষ্কার জিজ্ঞেস করি যে) আমি ব্যতীত তাদের কি এমন দেবতা আছে, যারা (উল্লিখিত আযাব থেকে) তাদেরকে রক্ষা করবে? (তারা তাদের কি হিফাযত করবে, তারা তো এমন অক্ষম ও অপারক যে) তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করার শক্তি রাখে না। (যেমন কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে দিতে শুরু করলেও তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে না। কোরআন বলে وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ সুতরাং তাদের দেবতা তাদের হিফাযত করতে পারে না) এবং আমার মুকাবিলায় তাদের কোন সঙ্গীও হবে না। (তারা যে এসব উজ্জ্বল প্রমাণ সত্ত্বেও সত্যকে কবুল করে না, এর কারণ দাবি অথবা প্রমাণের ত্রুটি নয়;) বরং (আসল কারণ এই যে) আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে (দুনিয়ায়) অনেক ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমন কি তাদের ওপর (এ অবস্থায়) দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। (তারা পুরুষানুক্রমে বিলাসিতায় মত্ত ছিল এবং খেয়েদেয়ে তর্জন-গর্জন করছিল। উদ্দেশ্য এই যে, তারাই গাফিল ছিল; কিন্তু শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এতটুকু গাফিলতি উচিত নয়। এখানে একটি হুঁশিয়ারির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তা এই যে) তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) দেশকে (ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতুর্দিক থেকে অনবরত সংকুচিত করে আনছি। এরপরও কি তারা (আশা রাখে যে, রসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) জয়ী হবে? (কেননা অভ্যস্ত ইঙ্গিত এবং আল্লাহ্র প্রমাণাদি এ বিষয়ে একমত যে, তারা বিজিত ও ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হবে---যে পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয় এবং ইসলামের সাহায্য বর্জন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও যদি তারা মূর্খতা ও হঠকারিতাবশত আযাবেরই ফরমায়েশ করে, তবে) আপনি বলে দিনঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি (আযাব আসা আমার সাধ্যের বাইরে। দাওয়াতের এই তরীকা ও হুঁশিয়ারি যদিও যথেষ্ট, কিন্তু) এই বধিরদের যখন (সত্যের দিকে ডাকার জন্য

আযাব দ্বারা) সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক শোনেই না। (এবং চিন্তাভাবনাই করে না বরং সেই আযাবই কামনা করে। তাদের সাহসিকতার অবস্থা এই যে) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তবে (সব বাহাদুরী নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (ব্যস, এতটুকু সাহস নিয়েই আযাব চাওয়া হয়। তাদের এই দুষ্টুমির পরিপ্রেক্ষিতে তো দুনিয়াতেই ফয়সালা করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি অনেক রহস্যের কারণে প্রতিশ্রুত শাস্তি দুনিয়াতে দিতে চাই না; বরং পরকালে দেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি। সেখানে) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের দাড়িপাল্লা স্থাপন করব (এবং সবার আমল ওজন করব)। সুতরাং কারও ওপর বিন্দুমাত্রও জুলুম হবে না, (জুলুম না হওয়ার ফলে) যদি (কারও কোন) কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা (সেখানে) উপস্থিত করব (এবং তাও ওজন করব) এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (আমার ওজন ও হিসাব গ্রহণের পর কারও হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন থাকবে না। বরং এর ভিত্তিতেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে তাদের দুষ্টুমিরও উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শাস্তি প্রদান করা হবে।)

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ----পূর্ববর্তী আয়তসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আ) অথবা ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দ্রুত মৃত্যু কামনা করত; যেমন কোন কোন আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রসূল নয়, রসূল হলে মৃত্যু হত না; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যে-সব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেন নি? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুয়তের ও রিসালতে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই

মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে ?

اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست
کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

(শত্রু মারা গেলে খুশী হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের জীবনও অমর নয়।)

**মৃত্যু কি ?** ঃ এরপর বলা হয়েছে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীব-মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نفس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত।—(রূহুল মা'আনী) আলিমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।—(রূহুল মা'আনী)

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ্ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোন কোন আল্লাহ্ওয়ালা সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে از محبت تلخہا شیریں شوند (ভালবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।) কবি বলেন ঃ

غم چہ استادہ تو بر در ما
اندر آ یار ما برادر ما

মওলানা রূমী বলেনঃ

رنج راحت شد چو مطلب شد بزرگ
گرد گلہ توتیا ئے چشم گرگ

**সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষাঃ** وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পসন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুযুর্গগণ বলেনঃ বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত উমর (রা) বলেনঃ

بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر—অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম; কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

**ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয়ঃ** خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ—عجل শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র-দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا —অর্থাৎ মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌঁছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে "ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে" প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্বরাপ্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয়; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্য কাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলেঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي—এখানে آيات (নিদর্শনাবলী) বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ;---(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হত।

**কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা ঃ** وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ—موازين শব্দটি ميزان এর বহুবচন। অর্থ ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়ি-পাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে---সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে। ---(মাযহারী)

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন ঃ অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে। সে আর কোনদিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারী হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে ঃ অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনদিন কামিয়াব হবে না। উপরোক্ত হাফেয হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়---হযরত জিবরাঈল (আ)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপনার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন? তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের তিন জায়গায়

কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক, যখন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারও কথা কারও স্মরণে আসবে না। দুই, যখন আমলনামাসমূহ উড্ডীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে---এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কথাই কারও মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আযাবের লক্ষণ হবে। তিন, পুলসিরাতে ওঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে না।----(মাযহারী)

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا---অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

**আমল কিরূপে ওজন করা হবে?** ঃ হাদীসে বেতাকাহ-র ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কোরআনের وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে।

**আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ ঃ** তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তোমার শাস্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপার মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় বেশী হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ কর নি وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ---লোকটি আরয করল ঃ এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।---(কুরতুবী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٤٨ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُوْنَ ۝٤٩ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۭ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٥٠

**(৪৮) আমি মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্ ভীরুদের জন্যে---(৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কিয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর?**

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (আপনার পূর্বে) মূসা ও হারূন (আ)-কে ফয়সালার, আলোর এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশের বস্তু (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম, যারা (মুত্তাকীগণ) না দেখে তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং (আল্লাহ্কেই ভয় করার কারণে) কিয়ামতকে (ও) ভয় করে (কেননা, কিয়ামতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভয় রয়েছে। তাদেরকে যেমন আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তেমনি) এটা (অর্থাৎ কোরআনও) একটা কল্যাণময় উপদেশ (গ্রন্থ যা আমি নাযিল করেছি) অতএব (কিতাব নাযিল করা আল্লাহ্র অভ্যাস এবং কোরআন যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা প্রমাণিত হওয়ার পরও) তোমরা কি (এর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি) অস্বীকার কর?

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ---এই তিনটি গুণই তওরাতের। فرقان অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, ضياء অর্থাৎ অন্তরসমূহের জন্য আলো এবং ذكر অর্থাৎ মানুষের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন ঃ فرقان বলে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আ)-র সাথে ছিল; অর্থাৎ ফিরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফিরাউনী সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। ضياء ও ذكر উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই

অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, الفرقان এর পরে واو দ্বারা পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে فرقان তওরাত নয়---অন্য কোন বিষয়। والله اعلم

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا
وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ
فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ
وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ
اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا
كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ
اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾
قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا
ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ
كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى

إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَٰهُ
وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا
لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴿٧٢﴾
وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ
ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

(৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সৎপন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত আছি। (৫২) যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন ঃ 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে আছ?' (৫৩) তারা বলল ঃ আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপদাদারাও। (৫৫) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ, না তুমি কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন ঃ না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন ; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তি-গুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। (৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত ; যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (৫৯) তারা বলল ঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। (৬০) কতক লোকে বলল ঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল ঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? (৬৩) তিনি বললেন ঃ না, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল ঃ লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাফ। (৬৫) অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে ঃ 'তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না।' (৬৬) তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না?' (৬৮) তারা বলল ঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম ঃ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের ওপর শীতল ও

**নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম। (৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহী করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আমি ইতি (অর্থাৎ মূসার যমানার) পূর্বে ইবরাহীম (আ)-কে (উপযুক্ত) সুবিবেচনা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর (জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠা) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তাঁর ঐ সময়টি স্মরণীয়) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তার সম্প্রদায়কে (মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে) বললেনঃ এই (বাজে) মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজারী হয়ে তোমরা বসে আছ? (অর্থাৎ এগুলো মোটেই পূজার যোগ্য নয়।) তারা (জওয়াবে) বলল ঃ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (তারা জ্ঞানী ছিল। এতে বোঝা যায় যে, এরা পূজার যোগ্য।) ইবরাহীম (আ) বললেনঃ নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ (এদেরকে পূজনীয় মনে করার ব্যাপারে) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (লিপ্ত) আছে; (অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেই এদের পূজনীয় হওয়ার কোন প্রমাণ ও সনদ নেই। তারা এ কারণে ভ্রান্তিতে লিপ্ত। আর তোমরা প্রমাণহীন, ভ্রান্ত কুসংস্কারের অনুসারীদের অনুসরণ করে ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছ। তারা ইতিপূর্বে এমন কথা শোনেনি। তাই আশ্চর্যান্বিত হল এবং) তারা বলল ঃ তুমি কি (নিজের মতে) সত্য ব্যাপার (মনে করে) আমাদের সামনে উপস্থিত করছ, না (এমনিতেই) কৌতুক করছ? ইবরাহীম (আ) বললেনঃ না (কৌতুক নয়; বরং সত্য কথা। শুধু আমার মতেই নয়---বাস্তবেও এটাই সত্য যে, এরা পূজার যোগ্য নয়) তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা (যিনি ইবাদতের যোগ্য) তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। তিনি (পালনকর্তা ছাড়াও) সবাইকে (অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো সহ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকে) সৃষ্টি করেছেন। আমি এর (অর্থাৎ এই দাবীর) পক্ষে প্রমাণও রাখি। (তোমাদের ন্যায় অন্ধ অনুকরণ করি না।) আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের এই মূর্তিগুলোর দুর্গতি করব যখন তোমরা (এদের কাছ থেকে) চলে যাবে (যাতে তাদের অক্ষমতা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা এ কথা ভেবে যে, সে একা আমাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে হয়তো এ-দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না এবং সবাই চলে গেল)। তখন (তাদের চলে যাওয়ার পর) তিনি মূর্তিগুলোকে কুড়াল ইত্যাদি দ্বারা ভেঙ্গে-চুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত। [এটি আকারে অথবা তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার দিক দিয়ে বড় ছিল। ইবরাহীম তাকে রেহাই দিলেন। এতে একপ্রকার বিদ্রূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, একটি আস্ত ও অন্যগুলো চূর্ণবিচূর্ণ

হওয়া থেকে যেন ধারণা জন্মে যে, হয়তো সে-ই অন্যগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। সুতরাং প্রথমত এই ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এরপর যখন তারা চূর্ণকারীর অনুসন্ধান করবে এবং প্রধান মূর্তির প্রতি সন্দেহও করবে না, তখন তাদের পক্ষ থেকে এর অপারকতারও স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে এবং প্রমাণ আরো অপরিহার্য হবে। সুতরাং পরিণামে এটা জব্দ করা এবং লক্ষ্য অপারকতা প্রমাণ করা। মোটকথা, এই উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) প্রধান মূর্তিকে রেহাই দিয়ে অবশিষ্ট সবগুলো ভেঙ্গে দিলেন।] যাতে তারা ইবরাহীমের কাছে (জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) প্রত্যাবর্তন করে। (এরপর ইবরাহীম জওয়াব দিয়ে পূর্ণরূপে সত্য প্রমাণিত করতে পারেন। মোটকথা, তারা পূজামণ্ডপে এসে মূর্তিগুলোর করুণ দৃশ্য দেখল এবং) তারা (পরস্পরে) বলল ঃ আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এরূপ (ধৃষ্টতাপূর্ণ) আচরণ কে করল? নিশ্চয় সে বড় অন্যায় করেছে। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বোক্ত কথা تَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ الخ যাদের জানা ছিল না, তারাই এ প্রশ্ন করল। হয়তো তারা তখন বিতর্কে উপস্থিত ছিল না। কারণ, বিতর্কে সবারই উপস্থিত থাকা জরুরী নয় অথবা উপস্থিত থেকেও তারা শোনেনি এবং কেউ কেউ শুনেছে। [দুররে মনসূর] তাদের কতক (যারা পূর্বোক্ত কথা জানত তারা) বলল ঃ আমরা এক যুবককে এই মূর্তিদের সম্পর্কে (বিরূপ) সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (অতঃপর) তারা (সবাই কিংবা যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা) বলল ঃ (তাহলে) তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর। যাতে (সে স্বীকার করে এবং) তারা (তার স্বীকারোক্তির) সাক্ষী হয়ে যায় (এভাবে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে শাস্তি দেয়া যায়। ফলে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। মোটকথা, ইবরাহীম সবার সামনে আসলেন এবং তাঁকে) তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এ কাণ্ড করেছ? তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ (তোমরা এই সম্ভাবনা মেনে নাও না কেন যে, আমি এ কাণ্ড) করিনি, বরং তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। (যখন এই প্রধানের মধ্যে কারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তখন এই ছোটদের মধ্যে বাকশক্তিশীল হওয়ার সম্ভাবনাও হবে।) অতএব তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর, যদি তারা বাকশক্তিশীল হয়। (পক্ষান্তরে যদি প্রধান মূর্তির কারক হওয়া এবং ছোট মূর্তিগুলোর বাকশক্তিশীল হওয়া বাতিল হয়, তবে তাদের অক্ষমতা তোমরা স্বীকার করে নিলে। এমতাবস্থায় উপাস্য মেনে নেয়ার কারণ কি?) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং (পরস্পর) বললঃ আসলে তোমরাই অন্যায়ের ওপর আছ। (এবং ইবরাহীম ন্যায়ের ওপর আছে। যারা এমন অক্ষম তারা কিরূপে উপাস্য হবে)। অতঃপর (লজ্জায়) তাদের মস্তক নত হয়ে গেল। [তারা ইবরাহীম (আ)-কে পরাজয়ের সুরে বলল ঃ] হে ইবরাহীম, তুমি তো জান যে এই মূর্তিরা (কিছুই) বলতে পারে না। (আমরা এদেরকে কি জিজ্ঞেস করব! তখন) ইবরাহীম (তাদেরকে খুব ভর্ৎসনা করে) বললেন ঃ (আফসোস, এরা যখন এমন, তখন) তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে

এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক, তোমাদের জন্যে (কারণ, তোমরা সত্য পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যাকে আঁকড়ে আছ।) এবং তাদের জন্যেও আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? [ইবরাহীম (আ) মূর্তি ভাঙ্গার কথা অস্বীকার করলেন না। তবে কাজটি যে তাঁরই, তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তাঁর বক্তব্যের জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আরও ক্রুদ্ধ হল। কারণ,

چو حجت نماند جفا جوئے را
بہ پرخاش در هم کشد روئے را

অর্থাৎ সামর্থ্যবান মূর্খ জওয়াব দিতে অক্ষম হলে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই নীতি অনুযায়ী] তারা (পরস্পরে) বলল ঃ একে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের (তার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও। যদি তোমরা কিছু করতে চাও (তবে এ কাজ কর, নতুবা ব্যাপার সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে। মোটকথা, সবাই সম্মিলিতভাবে এর আয়োজন করল এবং তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। তখন) আমি (অগ্নিকে) বললাম ঃ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (অর্থাৎ পুড়ে যাওয়ার মত উত্তপ্ত হয়ো না এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ো না, বরং মৃদুমন্দ বাতাসের মত হয়ে যাও। সেমতে তাই হল) তারা তাঁর অনিষ্ট করতে চেয়েছিল (যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান), অতঃপর আমি তাদেরকে বিফল মনোরথ করে দিলাম। (তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না; বরং উল্টা ইবরাহীমের সত্যতা আরও অধিকতরভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল।) আমি ইবরাহীমকে ও (তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে (সে সম্প্রদায়ের বিপরীতে ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কোরআনে আছে فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ—এ কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁরও শত্রু এবং অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট ছিল।) ঐ দেশের দিকে (অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে) পৌঁছিয়ে (কাফিরদের অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার করলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (জাগতিক কল্যাণও, কারণ সেখানে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ফলফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে অন্য লোক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় কল্যাণও; কারণ, বহু পয়গম্বর সেখানে বিরাজিত হয়েছেন। তাদের শরীয়তসমূহের কল্যাণ দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম আল্লাহ্র নির্দেশে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন।) এবং (হিজরতের পর) আমি তাকে (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে (পুত্র ও পৌত্রকে উচ্চস্তরের) সৎকর্মপরায়ণ করলাম। (উচ্চস্তরের সৎকর্ম হচ্ছে পবিত্রতা, যা মানুষের মধ্যে নবীদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অর্থ এই যে, প্রত্যেককে নবী করলাম।) আর আমি তাদেরকে নেতা করলাম (যা নবুয়তের অপরিহার্য অঙ্গ)। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত (যা নবুয়তের করণীয় কাজ); আমি তাদের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম